মহাকবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে নৈসর্গিক উপাদান

ড. শান্টু বড়ুয়া*

Abstract: Asvaghosa was a genius and famous poet of the 1st century A.D. of ancient India. He is considered the greatest epic poet, especially for his two remarkable literary works: *Buddhacarita* and *Soundarananda*. Both the epics were written in the Sanskrit Language. The life and teachings of Buddha are the main subjects of these two epics. However, the epics include abundant information on religions, politics, economics, geography, nature, society, and the culture of ancient India. As a result, these two epics are considered as the primary sources of Indian history. In this article, I have explored the natural information of ancient India, particularly on the rivers, trees, seasons, hills, mountains, vines, leaves, flowers, fruits, and other environmental elements mentioned in those epics by Asvaghosa.

১. ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের অসাধারণ প্রতিভাধর এবং প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন অশ্বঘোষ। তিনি ছিলেন একাধারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠক, কবি, নাট্যকার, দার্শনিক, বৌদ্ধতত্ত্বজ্ঞানী ও তার্কিক। তবে সব ছাপিয়ে অশ্বঘোষ একজন মহাকবি হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। জানা যায়, তিনি কুশান রাজসভার সদস্য পদেও আসীন ছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, অশ্বঘোষ কুশান সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে ধর্মীয় ও সাহিত্য জগতে বহু ঐতিহাসিক কর্ম সম্পাদন করেন। সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকাল ছিল খ্রিষ্টীয় ৭৮ হতে ১০১ অব্দ পর্যন্ত। এ তথ্যের ভিত্তিতে অশ্বঘোষের সময় নির্ধারণ করা হয় খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। বিভিন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যেও অশ্বঘোষকে প্রথম শতাব্দীর দার্শনিক ও মহাকবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দর্শন-তত্ত্ব তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হলেও উপস্থাপনা ছিল রসাত্মক। কাব্যরসে সমৃদ্ধ ছিল অশ্বঘোষের রচিত কাব্যসমূহ। তাঁর কাব্য সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, 'তৎ কাব্য ধর্ম্মাৎ কৃতম' অর্থাৎ তিনি সর্বতোভাবে কাব্যধর্ম রীতি অনুসারে কাব্য রচনা সুসম্পন্ন করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর সদর্প পদচারণা। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: *বুদ্ধচরিত, সৌন্দরানন্দ, রাষ্ট্রপাল, শারিপুত্রপ্রকরণ, খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, শত-পঞ্চশতক-নাম স্তোত্র, গণ্ডি-স্তোত্র-গাথা, বজ্রযান-মূলাপত্তি-সংগ্রহ, স্থূলাপত্তি, শোক-বিনোদন, অষ্টাক্ষণ-কথা, মণিদ্বীপ-মহাকারুণিক-পঞ্চ-দেব-স্তোত্র, গুরু-পঞ্চাশিকা, মহাকাল-কল্প-রুদ্র-কল্প-মহাশ্মশান-নাম-টীকা, দশ-অকুশল-কর্ম-পথ-নির্দেশ, পরিণামসা-সংগ্রহ, বুদ্ধচরিত-নাম-মহাকাব্য, বজ্র-সত্ত্ব-প্রশ্নোত্তর এবং নাম বিহীন একটি প্রতীকী নাটক প্রভৃতি (Debiprasad, 1980: 392-393)। তাঁর উল্লিখিত সাহিত্যকর্মের মধ্যে বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরানন্দ* কাব্যদ্বয় সংস্কৃত আলংকাকারীকগণের বিচারে উৎকৃষ্ট মহাকাব্য হিসেবে বিবেচিত। কাব্য দুটি সাহিত্য রীতি ও অলংকার শাস্ত্রের সকল রীতি-নীতি পূর্ণ করে অনন্যসাধারণ ও সর্বোতভাবে মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। এছাড়া লেখক নিজেই উভয় কাব্য গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থদ্বয়কে 'মহাকাব্য' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ কারণে সংস্কৃত সাহিত্য

* ড. শান্টু বড়ুয়া সহযোগী অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জগতে তিনি মহাকবি অশ্বঘোষ নামেই সমধিক পরিচিত। বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরানন্দ মহাকাব্য দুটি গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত হলেও মহাকাব্যদ্বয়ে প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া মহাকাব্যদ্বয়ে সুচারুরূপে কাব্যিক সুধায় প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যেমন, নদ-নদী, বৃক্ষ, ঋতু, পাহাড়, পর্বত, লতা, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতির বর্ণনা ফুটে উঠেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের স্বরূপ এবং সেগুলোর পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হবে। নিচে *বুদ্ধচরিত* ও *সৌন্দরানন্দ* মহাকাব্যদু'টির বিষয়সংক্ষেপ উপস্থাপন করে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে প্রকৃতির নানা উপাদানের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা তুলে ধরা হয়েছে।

২. মহাকাব্য বুদ্ধচরিতের পরিচয়

বুদ্ধচরিত মহাকবি অশ্বঘোষের এক অনবদ্য সৃষ্টি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এ গ্রন্থের সংস্কৃত নাম 'বুদ্ধচরিতম্'। এ মহাকাব্যটিতে গৌতম বুদ্ধের মহাজীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। শাক্যবংশের গোড়াপত্তনের ইতিবৃত্ত, সিদ্ধার্থের জন্ম, সিদ্ধার্থ সম্পর্কে ঋষি অসিতের পূর্বাভাষ, কৈশোরে রাজকুমার সিদ্ধার্থের পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি উদাসীনতা, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, যৌবনকাল, বিবাহোৎসব, পুত্র সন্তানলাভ, মহাভিনিষ্ক্রমণ বা গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্ব লাভ, সারনাথের ঋষিপত্তন মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন তথা ধর্মপ্রচার ইত্যাদি ঘটনাসমূহ ধারাবাহিকভাবে কাব্যিক অলংকারে মহাকবি অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। মহাকবি অশ্বঘোষ এ মহাকাব্যে উপমা, যুক্তি, ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগের মাধ্যমে বুদ্ধের জীবন কাহিনি সহজ-সরল এবং সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। সংস্কৃত ছাড়াও এ মহাকাব্যের তিব্বতি এবং চৈনিক ভাষায় ২৮টি সর্গের অনুবাদ পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত ভাষার মূল পাণ্ডুলিপির মাত্র ১৭টি সর্গ আবিষ্কৃত হয়েছে, অবশিষ্ট সর্গগুলো পাওয়া যায়নি। মূল সংস্কৃত এবং বাংলা অনুবাদসহ এটি কলকাতার নবপত্র প্রকাশন থেকে সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে বিশ্বের বহুল প্রচলিত ভাষায় যেমন, ইংরেজি, জার্মান, তিব্বতি, চৈনিক, ল্যাটিন, ফরাসি, জাপানি, হিন্দি ও বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

৩. মহাকাব্য সৌন্দরানন্দের পরিচয়

সৌন্দরানন্দ অশ্বঘোষের দ্বিতীয় মহাকাব্য। এটিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং এ গ্রন্থের সংস্কৃত নাম 'সৌন্দরনন্দম্'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮টি সর্গ বিশিষ্ট এ কাব্যের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ১৮৯৮ সালে নেপালের রাজদরবার লাইব্রেরি থেকে আবিষ্কার করেন। তিনি পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা করে ১৯১০ সালে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশ করেন। ১৯২৮ সালে E. H. Jonston লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি অনুবাদসহ বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরানন্দ গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করেন। বিমলাচরণ লাহা সৌন্দরানন্দ কাব্যের প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ১৯২২ সালে। বর্তমানে এটি সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারের নবম খণ্ডে মূল সংস্কৃত এবং বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে। সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের দৈহিক সৌন্দর্য; তাঁর অপ্সরাসম সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি বিমুগ্ধতা এবং স্ত্রীসঙ্গ লাভের জন্য রাজ্য, নিজের ভবিষৎ, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব বেমালুম ভুলে যাওয়া; বুদ্ধের সাথে নন্দের সাক্ষাৎ; নন্দকে বুদ্ধের ধর্ম দেশনা; ভিক্ষুসংঘে নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ; নন্দের স্বর্গের অপ্সরা দর্শন; মর্তে এসে স্বর্গজয়ের সাধনায় সচেষ্ট হওয়া; তৎপরবর্তী সময়ে বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দের পরামর্শে দুঃখমুক্তির পথ নির্বাণ লাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ প্রভৃতি ঘটনাসমূহ সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে

ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বুদ্ধচরিতের মতো এ গ্রন্থটিও কাব্যশৈলীতে, অলংকার প্রয়োগে, শব্দ চয়নে ও প্রকাশভঙ্গিমায় অতুলনীয় (বিনয়েন্দ্রনাথ, ১৯৯৫: ১৯৪)।

৪. মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত নৈসর্গিক উপাদানসমূহের স্বরূপ

৪.১. পর্বত

পর্বতমালা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান। পাহাড়-পর্বত কথাটা শুনলে আমাদের মনের মধ্যে প্রথম যে আলেখ্য ভেসে উঠে সেটা হলো, একটি বিশাল প্রকৃতি সৃষ্ট মাটির বা বরফের ঢিবি। নানাজন নানাভাবে এর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। কবি-সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন সময় তাঁদের সাহিত্যকর্মে পর্বতের সৌন্দর্য ও গুরুত্ব নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। মহাকবি অশ্বঘোষও তাঁর বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে নানা উপমায় অত্যন্ত সুচারুরূপে বিভিন্ন পর্বতের বর্ণনা দিয়েছেন, যা নিচে তুলে ধরা হলো:

হিমালয় এশিয়ার একটি পর্বতমালা যা তিব্বতীয় মালভূমি থেকে ভারতীয় উপমহাদেশকে পৃথক করেছে। হিমালয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণি। ভৌগোলিকভাবে হিমালয় পাকিস্তান, ভারত, তিব্বত, ভুটান এবং নেপালের বিস্তৃতভাগ জুড়ে অবস্থিত। এ পর্বতমালা থেকে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদী উৎপন্ন হয়েছে। প্রাচীনকালে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যে হিমালয় পর্বত সম্পর্কিত নানান ধরনের তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্বে (Ch. 253), ঋগ্বেদ (X.121.4) এবং ধর্মসূত্রে (B.1.2.10, Va.1.8) হিমালয়কে আর্যাবর্তের উত্তর সীমান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (Suresh, 1962: 232)। অথর্ববেদে (XII. 1, 11) হিমালয় পর্বতকে হিমবন্ত এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে (Ch. 54, 55, 57, 59) হিমবন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আরো উক্ত আছে, ধনুকের দুই প্রান্তকে একটি তার যেমন সংযোগ করে তেমনি একটি সমুদ্রকে আরেকটি সমুদ্রের সাথে যোগ করছে এ হিমালয় (Pargiter, *1904: 277)*। এ তথ্যের ভিত্তিতে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বি. সি. ল্য (B. C. Law) বলেন, সমগ্র পর্বত শ্রেণিটি পশ্চিম অংশের সুলায়মান থেকে পূর্বের আসাম ও আরাকানকে সংযোগ করেছে (Bimala, 1954: 82)। পালি সাহিত্যেও এ হিমালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক পালি বংস সাহিত্য মহাবংস এবং থূপবংস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মৌর্য সম্রাট অশোক মজ্ঝিম স্থবিরকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য হিমবন্ত অঞ্চলে প্রেরণ করেন (Wilhelm, 1912: 82; N. A. Jayawickrama, 1971: 192)। মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হিমালয় হলো দশটি নদীর উৎপত্তিস্থল (V. Trenckner, 1962: 114)। পরমত্থজ্যোতিকা অট্ঠকতায় উল্লেখ আছে, গন্ধমাদনকে ঘিরে যে সাত পর্বতমালা রয়েছে হিমালয় তার একটি। মহাকবি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যে যেভাবে হিমালয় পর্বতকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন মহাকবি অশ্বঘোষ হিমালয়কে সেভাবে সুস্পষ্ট করেননি। তবে অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে হিমালয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গের ৭ সংখ্যক শ্লোকে হিমালয়কে আদ্রিরাজ এবং গিরিরাজ বলে অভিহিত করেছেন। উভয় মহাকাব্যে কবি পর্বতের শীর্ষ দেশকে তুষার টুপি পরিহিত হিমবান এবং হিমবত বলে অভিহিত করেছেন (বুদ্ধচরিত: ৭ম সর্গ - শ্লোক ৩৯, ৮ম সর্গ - শ্লোক ৩৬, ৯ম সর্গ - শ্লোক ৭৬; সৌন্দরানন্দ: ১০ম সর্গ - শ্লোক ৫ এবং ১৩)। কবি হিমালয়কে *সৌন্দরানন্দ* কাব্যের দশম সর্গের ৭ সংখ্যক শ্লোকে উত্তর সীমান্তের রক্ষক বলে বর্ণনা করেছেন। মহাকাব্যদ্বয়ের আরো কিছু তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, হিমালয়ে তপস্বীদের শান্তিতে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। মহাকবি অশ্বঘোষ সৌন্দরানন্দ কাব্যে হিমালয়ে ঋষি কপিলের আশ্রমের চমৎকার বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এভাবে:

তস্য বিস্তীর্ণতপসঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে।

ক্ষেত্রং চায়তনং চৈব তপসামাশ্রয়োহভবৎ ॥
চারুবীরুত্তরুবনঃ প্রস্নিগ্ধমৃদুশাদ্বলঃ।
হবির্ধূমবিতানেন যঃ সদাভ্র ইবাবভৌ ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১১৭)

অর্থাৎ, হিমালয়ের পবিত্র ভূমিতে আশ্রম নির্মাণ করেছিলেন দীর্ঘস্থায়ী তপস্যার জন্য– এই আশ্রম ছিল তপস্যার মন্দির এবং আবাসস্থল বা নিকেতন। সেই স্থান সুন্দর লতা ও তরুকুঞ্জ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল, আর ছিল স্নিগ্ধ ও শ্যামল তৃণক্ষেত্র। অনবরত আহুতির কারণে যজ্ঞীয় ধূমে সে আশ্রম স্থান মেঘের মতো প্রতিভাত হতো।

অশ্বঘোষ প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান বা অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখা চিহ্নিত করণে পর্বতকে সীমানা নির্ধারক হিসেবে নির্দেশ করেছেন। তিনি সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ৬২ সংখ্যক শ্লোকে মধ্যদেশকে হিমালয় ও পারিযাত্রা পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত স্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন:

তয়োঃ সৎপুত্রয়োর্মধ্যে শাক্যরাজো ররাজ সঃ।
মধ্যদেশ ইব ব্যক্তো হিমবৎপারিপাত্রয়োঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১২৫)

অর্থাৎ, হিমালয় ও পারিয়াত্রা পর্বতের মধ্যখানে যেমন মধ্যদেশ পরিশোভিত, শাক্যরাজও তেমনি দুই সৎপুত্রের মধ্যখানে শোভিত হতে লাগলেন।

এ তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, অশ্বঘোষের কালে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে মধ্যদেশের সীমারেখা হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত বা ভিন্ধিয়া পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল (Sarala Khosla, 1986: 82)।

হিমালয় পর্বতমালার অন্যতম শাখা মন্দার পর্বতের কথাও কবি তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের বনপর্বে মন্দার পর্বতকে হিমালয়ের অন্যতম একটি শ্রেণি বলা হয়েছে এবং পর্বতটি পূর্বদিকে অবস্থিত বলে উল্লেখ আছে। উক্ত মহাকাব্যে আরো উল্লেখ আছে, পর্বতটি গন্ধমদন পর্বতের অংশ ছিল, যা বদ্রিকাশ্রমের উত্তরে অবস্থিত ছিল (N. L. Dey, 1971: 125)। বুদ্ধচরিত কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের ১৩ সংখ্যক শ্লোকে মহাকবি অশ্বঘোষ মন্দরা পর্বতকে সুউচ্চ ও রৌদ্রময় পর্বত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার সৌন্দরানন্দ কাব্যে তিনি মন্দরা পর্বতকে ঐশ্বর্যশালী বলে আখ্যায়িত করেছেন। মন্দরা পর্বতের বর্ণনা মহাকবি অশ্বঘোষ সৌন্দরানন্দ কাব্যে নিম্নরূপভাবে তুলে ধরেছেন:

বসুমদ্ভিরবিভ্রান্তৈরলংবিদ্যৈরবিস্মিতৈঃ।
যদ্বভামে নরৈঃ কীর্ণং মন্দরঃ কিন্নরৈরিব॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১২০)

অর্থাৎ, ঐশ্বর্যশালী, স্থিরবুদ্ধি, বিদ্বান, সপ্রতিভ লোকের দ্বারা সেই নগর শোভিত ছিল। নগরকে মনে হত যেন মন্দর পর্বত, এই পর্বতে কিন্নরেরা বাস করে–তারাও রত্নশালী, সাহসী ও নানা বিদ্যায় নিপুণ।

মহাকবি অশ্বঘোষের যে পর্বতের সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেছেন তা হলো কৈলাশ। কৈলাশ পর্বত তিব্বতের হিমালয় পর্বতমালার একটি অংশ। সিন্ধু নদী, শতদ্রু নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ প্রভৃতি নদীগুলোর উৎস স্থান হল কৈলাশ পর্বত। সংস্কৃত 'কেলাস' শব্দ থেকে কৈলাশ কথাটির উৎপত্তি। পুরাণে (Kālikāpurāṇa, ch. 14, 31.) কৈলাস পর্বতকে শিবের লীলাধাম বলা হয়েছে। তিব্বতি ভাষায় এর নাম গাঙ্গো রিনপোচে। তিব্বতে বৌদ্ধ গুরু পদ্মসম্ভবকে বলা হয় রিনপোচে। তাঁর নামেই তিব্বতিরা কৈলাশ পর্বতের নামকরণ করেছে। যার অর্থ হল বরফের তৈরি দামি রত্ন। জৈনদের কাছে এটি অষ্টপদ পর্বত নামে পরিচিত (Bimala, 1954: 88)। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কৈলাশকে হেমকূত বলে

আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহাকবি অশ্বঘোষ মনোমুগ্ধকর কৈলাশ পর্বতকে দৃঢ় বা অবিচল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সৌন্দর্যে মহিমান্বিত এ পর্বতের চূড়াকে কবি বলেছেন ঝকঝকে ও বৈচিত্র্য শিখরমণ্ডিত। কবি বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে পর্বতটির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

ইত্যেবং মগধপতির্বচো বভাষে ষঃ সম্যগ্বলভিদিব ব্রুবন্ বভাসে।
তচ্ছ্রুত্বা ন স বিচ্চাল রাজসূনুঃ কৈলাসো গিরিরিব নৈকচিত্রসানুঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৫৬)

অর্থাৎ, মগধের অধিপতি এই কথা বললেন, বলতে বলতে তিনি ইন্দ্রের মতো উদ্ভাসিত হলেন। তা শুনে সেই রাজপুত্র বহু বিচিত্র শিখর মণ্ডিত কৈলাস পর্বতের মতোই অবিচল রইলেন।

মহাকবি অশ্বঘোষ ভারতবর্ষের আরেক প্রসিদ্ধ বিন্ধ্য পর্বতের কথাও বুদ্ধচরিত কাব্যে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যে এ পর্বতের ঐশ্বর্যের কথা নানাভাবে উক্ত আছে। প্রাচীন সাহিত্যে বিন্ধ্য পর্বত সমগ্র ভারতকে উত্তরার্ধ এবং দক্ষিণার্ধ-এ দুটি অংশে বিভক্ত করেছে বলে উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে উত্তরার্ধ আর্যাবর্ত নামে এবং দক্ষিণার্ধ দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিতি লাভ করে (Bimala, 1941: 4)। বিন্ধ্য অঞ্চল সাংখ্য দর্শনের অন্যতম প্রচার স্থল ছিল। সাংখ্য দর্শনের একজন বিখ্যাত গুরু উক্ত পর্বতের নামে অর্থাৎ বিন্ধ্যাবাসিন নামে পরিচিত ছিল (Bimala, 1954: 88)। পুরাণ মতে, বিন্ধ্য পর্বত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। উত্তরের যমুনা এবং ছম্বল, দক্ষিণের তপ্তি এবং মহানদী অক্ষ, পশ্চিমের সমুদ্রতট (বর্তমান গুজরাট রাষ্ট্র) এবং পূর্বের ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত মালভূমি এবং পাহাড়সমূহ বিন্ধ্য পর্বতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বন্ধুর ভূখণ্ড, ঘন বন, সঙ্কীর্ণ নদী উপত্যকা, কম ঘন বসতিপূর্ণ লোকালয়, দুর্গম স্থান প্রভৃতি - এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ছিল (S. M. Ali, 1966: 157)। মহাকবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে বিন্ধ্য পর্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন:

কেচিৎ সমুদ্যম্য শিলাস্তরূংশ্চ বিষেহিরে নৈব মুনৌ বিমোক্তুম্।
পেতুঃ সবৃক্ষাঃ সশিলাস্তথৈব বজ্রাবভগ্না ইব বিন্ধ্যপ্যদাঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৭০)

অর্থাৎ, কেউ কেউ মুনির প্রতি বহু প্রস্তর ও বৃক্ষ ভুলেও নিক্ষেপ করতে পারল না বরং তারা বজ্রভগ্ন বিন্ধ্যাচলের মতই বৃক্ষ ও প্রস্তর নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এছাড়াও অশ্বঘোষ বিন্ধ্য পর্বতে ঋষি আরাড় আশ্রমে বাস করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে কবি বলেছেন:

তদ্বুদ্ধিরেষা যদি নিশ্চিতা তে তূর্ণং ভবান্ গচ্ছতু বিন্ধ্যকোষ্ঠম্।
অসৌ মুনিস্তত্র বসত্যরাল্তো যো নৈষ্ঠিকে শ্রেয়সি লব্ধচক্ষুঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৪৩)

অর্থাৎ, আপনার এই সংকল্প যদি ঠিক হয়ে থাকে, তবে আপনি দ্রুত বিন্ধ্যকোষ্ঠে গমন করুন। চরম কল্যাণে যিনি দৃষ্টিলাভ করেছেন সেই মুনি আরাড় সেখানে বাস করেন।

ঋষি আরাড়ের নাম বৌদ্ধ ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গে ঋষি আরাড়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। মহাকবি অশ্বঘোষ সর্গটি 'আরাড়দর্শন' নামে নামকরণ করেছেন। উক্ত সর্গে উল্লেখ আছে, রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগের পর আরাড়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কিছুকাল রাজগৃহে অবস্থান করেন এবং সেখানে গুরুর উপদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করতেন। ঋষি আরাড় স্বীয় শিষ্যদেরকে আকিঞ্চন্যায়তন ধর্ম শিক্ষা দিতেন। এই মতে, বিষয় বাসনা বিরহিত হয়ে সর্বত্যাগী

হওয়া হচ্ছে পরম মুক্তি। যদিও সিদ্ধার্থ এই শিক্ষায় বিশেষ তৃপ্তিলাভ করতে পারেননি (সতীশচন্দ্র, ২০০৩: ৭২-৭৩)।

কবি অশ্বঘোষ তাঁর মহাকাব্যে পর্বতের রাজা হিসেবে সুমেরু পর্বতের (উত্তরাখণ্ড, ভারত) নাম উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যেও এ পর্বতের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। পদ্ম পুরাণে উল্লেখ আছে যে, গঙ্গা নদী সুমেরু পর্বত হতে উৎপন্ন হয় এবং ভারতবর্ষের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে (S. M. Ali, 1966: 47)। মহাভারতের শান্তিপর্বেও অনুরূপ তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে সুমেরু পর্বতের বর্ণনা প্রদান করেছেন এভাবে:

মোক্ষায় চেদ্বা বনমেব গচ্ছেৎ তত্ত্বেন সম্যক্ স বিজিত্য কৃৎস্নম্।
মতং পৃথিব্যাং বহুমানমেতো রাজেত শৈলেষু যথা সুমেরুঃ ॥
যথা হিরণ্যং শুচি ধাতুমধ্যে মেরুর্গিরীণাং সরসাং সমুদ্রঃ।
তারাসু চন্দ্রস্তপতাং চ সূর্যঃ পুত্রস্তথা তে দ্বিপদেষু বর্ষঃ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১১২)

অর্থাৎ, ইনি যদি মোক্ষ-লাভের জন্য গমন করেন তবে ইনি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত মতো সম্পূর্ণরূপে জয় করে প্রভূত সম্মানের অধিকারী হবেন এবং তিনি পর্বতসমূহের মধ্যে সুমেরুর মতই বিরাজমান হবেন। যেমন; ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ পবিত্র, পর্বতের মধ্যে সুমেরু, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র এবং অগ্নির মধ্যে সূর্য, তেমনি মানুষের মধ্যে আপনার পুত্র শ্রেষ্ঠ।

উপরিউক্ত শ্লোক দুটিতে দেখা যায়, কবি সুমেরুকে পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধচরিতের পঞ্চম সর্গের ৪২ সংখ্যক শ্লোকে কবি উক্ত পর্বতকে প্রদীপ্ত এবং উজ্জ্বল পর্বত হিসেবে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও কবি সৌন্দরানন্দ কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের ২৯ সংখ্যক শ্লোকে সুমেরু পর্বতের সুউচ্চ শীর্ষে সূর্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত হতো বলে উল্লেখ করেছেন।

মহাকবি অশ্বঘোষের মহাকাব্যে বিশেষত বুদ্ধচরিত কাব্যে আরেকটি ঐতিহাসিক পর্বতের নামোল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো পাণ্ডব পর্বত। পালি সাহিত্য পাঠে জানা যায়, প্রাচীন ষোড়শ জনপদের অন্যতম জনপদ মগধের রাজধানী রাজগৃহের ভৌগোলিক সীমারেখা বৈভার, পাণ্ডব, ইসিগিলি (রত্নগিরি), গৃধ্রকূট এবং বৈপুল্য– এ পঞ্চপর্বত দ্বারা বেষ্টিত ছিল (M. Leon Feer, 1888: 191-192)। বুদ্ধচরিতের দশম সর্গের ২১ সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ আছে, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের সাথে মগধ রাজ বিম্বিসারের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এ পাণ্ডব পর্বতে। আলোচ্য পাণ্ডব পর্বত সম্পর্কে বুদ্ধচরিত কাব্যে কবি আরো বলেছেন:

আদায় ভৈক্ষংচ যথোপপন্নং বযৌ গিরেঃ প্রস্রবণং বিবিক্তম্।
ন্যায়েন তত্রাভ্যবহৃত্য চৈনন্মহীধরং পাণ্ডবমারুরোহ॥
তস্মিন্নবৌ লোধ্রবনোপগূঢ়ে ময়ূরনাদপ্রতিপূর্ণকুঞ্জে।
কাষায়বাসাঃ স বভৌ নৃসূর্যো যথোদয়স্যোপরি বালসূর্যঃ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৫৫)

অর্থাৎ, প্রাপ্ত ভিক্ষাগ্রহণের পর তিনি নিভৃত ঝর্ণার কাছে গেলেন এবং তা যথা নিয়মে ভোজন করে পাণ্ডব পর্বতের উপর আরোহণ করলেন। সে পর্বত লোধ্রবনে আচ্ছাদিত, তার কুঞ্জ ময়ূর ধ্বনিতে পূর্ণ এবং সেখানে নরসূর্য এমনভাবে শোভিত হলেন যেন উদয়গিরির ওপরে বালসূর্য উদিত।

উপরিউক্ত শ্লোক দু'টি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বঘোষ পাণ্ডব পর্বতকে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের পর্বত বলে উল্লেখ করেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর রাজকুমার সিদ্ধার্থ বিন্ধ্য পর্বতে যাওয়ার সময় পাণ্ডব পর্বত আরোহণ করেন। এ পর্বত লোধ্র গাছে পরপির্ণ ছিল। এ গাছের ছালের গুঁড়া সাধারণত প্রসাধনী হিসেবে ব্যবহার করা হতো (ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ২০১৫: ১০৬৩)। পর্বতটি বন ময়ূরের সুমধুর

ধ্বনিতে মুখরিত থাকত। এছাড়া আলোচ্য সর্গের ২১ সংখ্যক শ্লোকে কবি আরো উল্লেখ করেছেন, পাণ্ডব পর্বতের বর্ণ ছিল হাতির কানের মতো গাঢ় নীল এবং সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ উক্ত পর্বতের চূড়ায় ধ্যান করতেন।

উপর্যুক্ত পর্বত ছাড়াও কবি অশ্বঘোষ তাঁর মহাকাব্য বুদ্ধচরিতের পঞ্চম সর্গের ২৬ এবং ৪২ সংখ্যক শ্লোকে 'কাঞ্চন পর্বত, এবং 'কাঞ্চন শৈল' পর্বতের কথাও উল্লেখ করেছেন। এ দুটি পর্বতকে কবি উজ্জ্বল এবং সুবর্ণগিরি বা স্বর্ণের পাহাড় নামে অভিহিত করেছেন। Hultzch এই সুবর্ণগিরিকে নিজাম হায়দারাবাদ অঞ্চলের কনকগিরি বলে উল্লেখ করেছেন (E. Hultzsch, 1969: xxxiii)। হিউয়েন সাঙ সুবর্ণগিরি পর্বতকে la-lan-na-po-fa-ta নামে উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ হলো হিরণ্য পর্বত। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন পর্বতটি রোহিনল–এর ৩৩ মাইল পূর্বে অবস্থিত ছিল। কানিংহাম এই পর্বত এবং বৈভার পর্বত অভিন্ন বলে মনে করেন। তিনি আরো বলেন, এই পর্বতের কোনো একদিকে সপ্তপর্ণী গুহায় বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পরে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল (Alexander Cunningham, 1963: 390)। মহাভারতে সুবর্ণগিরিকে বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্তির নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.২. নদ-নদী

প্রাচীন সভ্যতা ছিল নদী কেন্দ্রিক। মানুষের জীবন-যাপন, সভ্যতার বিকাশ ও ঐশ্বর্যনির্মাণ, ইতিহাস, আন্দোলন-সংগ্রাম সব কিছুতেই নদীর ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। প্রাচীন সাহিত্যে নদীর কথা নানা উপমায় নানাভাবে ঝংকৃত হয়েছে। প্রাচীনকালে পর্বতের ন্যায় নদ-নদীও জনপদের সীমানা নির্ধারক হিসেবে ব্যবহার হতো, যা প্রাচীন সাহিত্য এবং অনুশাসনেও উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাকবি অশ্বঘোষের *'বুদ্ধচরিত'* ও *'সৌন্দরানন্দ'* মহাকাব্যদ্বয়েও প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন নদ-নদীর বর্ণনা পাওয়া যায়, যেগুলো ধর্মীয়, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। নিচে মহাকবি অশ্বঘোষের মহাকাব্যে উল্লেখিত নদ-নদী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হলো :

বৌদ্ধ সাহিত্যে নৈরঞ্জনা নদী সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও পবিত্র নদী হিসেবে উল্লেখ আছে (M. Leon Feer, 1898: 167)। গৌতম বুদ্ধ ৩৫ বছর বয়সে এই নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে ছয় বছর কঠোর সাধনা করে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধত্বলাভ করেন। আবিষ্কার করেন চারি মহা আর্য সত্য ও দুঃখ মুক্তির পথ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। বুদ্ধের জীবনের সাথে এ নদী গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই এ নদী বৌদ্ধ সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন নদীটি কুশিনগরের উত্তরে অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন (James Legge, 1836: 70)। অপর এক চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ নদীটি অতিক্রমের কথা উল্লেখ করেছেন। কানিংহামের মতে, হিউয়েন সাঙ এর ভারত ভ্রমণের পরে দুইশত বছর পর্যন্ত নদীটির নাম অপরিবর্তিত ছিল। তবে বর্তমানে নদীটি নাম ফল্গু নদী নামে পরিচিত (Alexander Cunningham, 1963: 386)। এই নদীর তীরেই যে বুদ্ধ অবস্থান করতেন, তা মহাকবি অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত কাব্যে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

> অথ নৈরঞ্জনাতীরে শুচৌ শুচিপরাক্রমঃ।
> চকার বাসমেকান্তবিহারাভিরতির্মুনিঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৬৬)

অর্থাৎ, অতপর একান্তে বসবাসের জন্য পুতপরাক্রম সেই শাক্যমুনি পবিত্র নৈরঞ্জনা তীরে বাস করতে লাগলেন।

বুদ্ধচরিতের দ্বাদশ সর্গের ১০৮ সংখ্যক শ্লোকে কবি আরো উল্লেখ করেছেন বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ এই নদীর তীরে বসবাস এবং স্নান কার্য সম্পাদন করতেন। কবির ভাষ্য মতে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা আগেই

নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বসবাস করতেন। অর্থাৎ বুদ্ধের সাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল এই নৈরঞ্জনা নদীর তীরেই। এখানেই তাঁরা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন (দ্বাদশ সর্গ, শ্লোক ৯১-৯২)। দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর তপস্যার পর বুদ্ধ উক্ত নদীর তীরেই বুদ্ধত্ব লাভের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

ব্যবসায়দ্বিতীয়োহথ শাদ্বলাস্তীর্ণভূতলম্।
সোহশ্বত্থমূলং প্রযযৌ বোধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৬৮)

অর্থাৎ, অতপর জ্ঞানের জন্য কৃত সংকল্পবদ্ধ হয়ে তিনি (বুদ্ধ) সংকল্পমাত্রকে সঙ্গি করে অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে সুবজ তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতলে উপস্থিত হন।

এখানে যে অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে তা নৈরঞ্জনা নদীর তীরবর্তী বুদ্ধগয়ার অর্থাৎ বুদ্ধ যে বৃক্ষের নিচে বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন তা নির্দেশ করা হয়েছে। নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বুদ্ধের এই তপস্যা-জীবনের কাহিনি জাতকসহ পালি এবং সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখ আছে। কবি সৌন্দরানন্দ কাব্যের তৃতীয় সর্গের ৪-৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত ঘটনা উপস্থাপন করেছেন।

ঐতিহাসিক গঙ্গা নদীর কথা মহাকবি অশ্বঘোষ তাঁর মহাকাব্যে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। গঙ্গা একটি পৌরাণিক নদী এবং ভারতবর্ষের পবিত্রতম নদী হিসেবে বিবেচিত। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন লোকে প্রবাহিত বলে গঙ্গার অপর নাম ত্রিলোকপথগামিনী। গঙ্গাস্নান হিন্দুদের কাছে একটি পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়। ঋগ্বেদ (X, 75, 5), রামায়ন, ধর্মসূত্র এবং পুরাণে এই নদীর পবিত্রতার কথা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, স্বর্গ হতে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা শিবের জটায় ধারণ করে নেমে আসেন মর্ত্যের হিমালয়ে। হিমালয় থেকে সমতলে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা মিশেছে বঙ্গোপসাগরে (Sarala Khosla, 1986: 96)। পালি সাহিত্যে বিশেষত মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হিমালয় থেকে উৎপন্ন প্রধান নদীগুলোর মধ্যে গঙ্গা একটি (V. Trenckner, 1962: 114)। মহাকবি অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে গঙ্গা নদীর কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

স রাজবৎসঃ পৃথুপীনবক্ষাস্তৌ হব্যমন্ত্রাধিকৃতৌ বিহায়।
উত্তীর্য গঙ্গাং প্রচলত্তরঙ্গাং শ্রীমদ্গৃহং রাজগৃহম্ জগাম॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৫৪)

অর্থাৎ, মন্ত্রী এবং পুরোহিতকে বিদায় দিয়ে রাজকুমার এগিয়ে চললেন। প্রশস্ত ও দৃঢ় বক্ষ তাঁর, তিনি (সিদ্ধার্থ) গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে রাজগৃহে পৌঁছান; এখানকার সব গৃহই শ্রীসম্পন্ন।

এছাড়াও পৌরাণিক উপাখ্যান উল্লেখ করে কবি বুদ্ধচরিত কাব্যে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের জন্মের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে:

ভীষ্মেন গঙ্গোদরসম্ভবেন রামেণ রামেণ চ ভার্গবেণ।
শ্রুত্বা কৃতং কর্ম পিতুঃ প্রিয়ার্থং পিতুস্ত্বমপ্যর্হসি কর্তুমিষ্টম্ ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৫০)

অর্থাৎ, গঙ্গার উদর থেকে সঞ্জাত ভীষ্ম এবং ভৃগুপুত্র পরশুরাম এঁরা সকলেই পিতার জন্য যে কাজ করেছেন তা শুনে আপনারও পিতার অভিলষিত কাজ করা উচিত।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভীষ্ম কুরু বংশের রাজর্ষি শান্তনুর পুত্র এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে জাত। প্রখ্যাত অষ্ট বসুদের মধ্যে অষ্টম বসু ইনি। তিনি বশিষ্ঠ মুণির শাপে স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন। পিতার স্বেচ্ছা বিবাহে নিজেকে অন্তরায় মনে করে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কখনোই পিতৃরাজ্য গ্রহণ করবেন না এবং চিরকাল অবিবাহিত থাকবেন। এই কঠিন প্রতীজ্ঞার জন্য তার নাম হলো ভীষ্ম। মহাভারতের বহু

অধ্যায়ে ভীষ্মের কথা উল্লিখিত আছে। কবি অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত কাব্যের 'কুমারের অন্বেষণ' নামক নবম সর্গে রাজকুমার সিদ্ধার্থের সত্য অনুসন্ধানের জন্য নানা গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা লাভের ঘটনা উপস্থাপন করেছেন। এ সর্গে কবি প্রসঙ্গক্রমে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের জন্মের কথা বর্ণনা করেন। সৌন্দরানন্দ কাব্যের সপ্তম সর্গের ৪০-৪১ সংখ্যক শ্লোকে কবি আরেকটি পৌরাণিক উপাখ্যানের বর্ণনা দিতে গিয়ে গঙ্গা নদীর কথা উল্লেখ করেন। উপাখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে যে গঙ্গার বিরহে শান্তনু আত্মসংযম হারিয়েছিলেন। আলোচ্য সর্গে নন্দের প্রেমময়স্মৃতি রোমন্থন করে বিলাপের কথাও আলোকপাত করা হয়েছে। পত্নীর রূপলাবণ্য এবং কামনা-বাসনার স্মৃতিকে পাশ কাটিয়ে নন্দের পক্ষে শ্রামণ্য বা সন্ন্যাস জীবনে মনোনিবেশ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই তিনি গৈরিক বসন পরিত্যাগ করে গৃহে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অর্থাৎ উপাখ্যানের শান্তনু এবং মহাকাব্যের নন্দের মনকষ্টকে কবি এক করে উপস্থাপন করেছেন।

অশ্বঘোষের কাব্যে বরুণা এবং অসি নদীর কথাও উল্লেখ আছে। গৌতম বুদ্ধের সময় বারাণসী ছিল কাশী রাজ্যের রাজধানী। উত্তর ভারতের প্রধানতম নদী গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই নগরীর দুই পাশে রয়েছে বরুণা ও অসি নদী। ধারণা করা হয় বারাণসী নগরীর নামকরণ করা হয়েছে এ দুটি নদীর নামানুসারে। এই দুই নদীর সাথে গঙ্গার সঙ্গম স্থল পবিত্র স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে (Alexander Cunningham, 1963: 368)। বৌদ্ধ সাহিত্যে উক্ত আছে যে, বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ বারাণসীর মৃগদাব ঋষিপত্তনে সর্বপ্রথম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের কাছে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন যা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে "ধর্মচক্র প্রবর্তন" নামে পরিচিত। বারাণসীকে ঘিরে থাকা বরুণা ও অসি নদীকে মহাকবি অশ্বঘোষ সশ্রদ্ধ চিত্তে উল্লেখ করেছেন। সৌন্দরানন্দ কাব্যে কবি নদীদ্বয়ের কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

> অববুধ্য চৈব পরমার্থমজরমনুকম্পয়া বিভুঃ।
> নিত্যমমৃতমুপদর্শয়িতুং স বরাণসীপরিকরাময়াৎপুরীম্ ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১২৬)

অর্থাৎ, জরাহীন সেই পরম সত্যের উপলব্ধির পর প্রভু তাঁর নিত্য অমৃততত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য বরণা ও অসি নদী বেষ্টিতা নগরীতে (বারাণসীতে) যাত্রা করলেন।

উপর্যুক্ত শ্লোকে কবি স্পষ্ট করেছেন যে, বুদ্ধের সময় বারাণসী নগরী বরুণা এবং অসি নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। কবি বুদ্ধচরিত কাব্যের চতুর্দশ সর্গের ১০৭ সংখ্যক শ্লোকে আরো উল্লেখ করেছেন বরুণা ও অসি নদীর তীর ঘনবনে আকীর্ণ ছিল।

মহাকবি অশ্বঘোষ স্বর্গের পবিত্র নদী হিসেবে মন্দাকিনী নদীর নাম উল্লেখ করেছেন। এটি ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের অলকানন্দা নদীর একটি শাখা। উত্তরাখণ্ড রাজ্যের কেদারনাথের কাছে চোরাবাড়ি হিমবাহ হতে এই নদীর উৎপত্তি হয়। কেদারনাথ এবং মধ্যমহেশ্বর মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এই নদীকে অত্যন্ত পবিত্র নদী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পালি অঙ্গুত্তর নিকায় এবং রামায়নে এ নদীর উল্লেখ আছে (Prof. E. Hardy, 1899: 101)। কবি অশ্বঘোষ সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে মন্দাকিনী নদীর উল্লেখ করেছেন এভাবে:

> হা চৈত্ররথ হা বাপি হা মন্দাকিনি হা প্রিয়ে।
> ইত্যার্তা বিলপন্তোহপি গাং পতন্তি দিবৌকসঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৫৫)

অর্থাৎ, পৃথিবীতে স্বর্গবাসীগণও যখন ফিরে আসেন, তখন তারা বিলাপ করতে থাকেন- হায় চিত্ররথ নির্মিত উপবন, হায় সরোবর, হায় মন্দাকিনী, হায় প্রিয়ে।

অশ্বঘোষ তাঁর মহাকাব্যে যমুনা নদীর কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি যমুনাকে উৎকষ্ট নদী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যমুনা ভারতবর্ষের পাঁচটি বড় নদীর মধ্যে অন্যতম। যমুনা হচ্ছে গঙ্গা নদীর অন্যতম

একটি শাখা। হিমালয়ের বান্দারপুচ পর্বতশৃঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশে অবস্থিত যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে এই নদী উৎপত্তি হয়েছে। এই নদী এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বিভিন্ন সাহিত্যে যমুনা নদীর বর্ণনা পাওয়া যায়। যা যমুনা নদীকে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি নদীতে পরিণত করেছে। ঋগ্বেদে (X, 75. 5) এই নদীটিকে একটি প্রাচীন নদী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পালি সাহিত্যে উল্লেখ আছে, হিমালয় থেকে উৎপন্ন দশটি গুরুত্বপূর্ণ নদীর মধ্যে যমুনা একটি (Prof. E. Hardy, 1899: 101)। মহাকবি অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে যমুনা নদীর কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে:

কালীং চৈব পুরা কন্যাং জলপ্রভবসংভবাম্।
জগাম যমুনাতীরে জাতরাগং পরাশরঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১২৮)

অর্থাৎ, পরাশর অনুরাগের বশবর্তী হয়ে যমুনা নদীর তীরে মৎস্যকন্যা কালীকে সম্ভোগ করেছিলেন।

অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে যমুনা নদীকে একটি উৎকৃষ্ট নদী হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, এ নদীর জলের রঙ গাঢ় নীল এবং নদীতে ফেনিল ঢেউ বিদ্যমান। বুদ্ধচরিতে কবি যমুনা নদীর সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

সিতশঙ্খোজ্জ্বলভুজা নীলকম্বলবাসিনী।
সফেনমালানীলাম্বূর্যমুনেব সরিদ্বরা ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৬৭)

অর্থাৎ, শুভ্র শঙ্খে তাঁর বাহু, পরিধানে নীল উত্তরীয় যেন নদী শ্রেষ্ঠা, ফেনরাজিমণ্ডিতা নীলসলিলা যমুনা।

৪.৩. উদ্ভিদ

পর্বত, নদ-নদীর মতো উদ্ভিদও প্রকৃতির অনুষঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন সময়ে রচিত সাহিত্যে সমান গুরুত্ব পেয়েছে। মহাকবি অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে উদ্ভিদের বর্ণনা দিয়েছেন। নিম্নে মহাকবি অশ্বঘোষের মহাকাব্যে বর্ণিত উদ্ভিদের বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

৪.৩.১. বন-বনানী: মহাকবি অশ্বঘোষ বনকে বন, অরণ্য, কান্তার প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ কাব্যের কোন কোন সর্গে বনকে কী কী নামে অভিহিত করেছেন তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

বন	**বুদ্ধচরিত:** ৩য় সর্গ শ্লোক ১২১; ৪র্থ সর্গ শ্লোক ২৭; ৫ম সর্গ শ্লোক ২; ৭ম সর্গ শ্লোক ৩২; ৮ম সর্গ শ্লোক ১, ৬, ১৩; ৯ম সর্গ শ্লোক ১, ১৪; চতুর্দশ সর্গ শ্লোক ৫৬, ১০৭; **সৌন্দরানন্দ:** ৫ম সর্গ শ্লোক ৩৮; ৭ম সর্গ শ্লোক ১১; ৮ম সর্গ শ্লোক ৮, ১৬, ২৯;
অরণ্য	**বুদ্ধচরিত:** ৫ম সর্গ শ্লোক ৩১; ৬ষ্ঠ সর্গ শ্লোক ৩৬; **সৌন্দরানন্দ:** ষোড়শ সর্গ শ্লোক ৮৬;
কান্তার	**বুদ্ধচরিত:** ১ম সর্গ শ্লোক ৭২; **সৌন্দরানন্দ:** ৭ম সর্গ শ্লোক ৯;

কবি বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যদ্বয়ে যেসব পাহাড়-পর্বতের কথা উল্লেখ করেছেন তা ছিল ঘন-বনে আবৃত এবং শহর-নগরও ছিল সবুজে আকীর্ণ। কবি বুদ্ধচরিতের দশম সর্গের ২১ সংখ্যক

শ্লোকে পাণ্ডু পর্বত ঘন-নীল বর্ণের বন-বনানীতে ভরপুর ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কবি হিমালয় পর্বতের নৈসর্গিক বর্ণনায় বলেছেন, এই পর্বত সুভাসিত গাছ-পালা, হ্রদ, ঝর্ণা এবং নদীর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বিষয়টি সৌন্দরানন্দ কাব্যে এভাবে তুলে ধরেছেন:

তৌ দেবদারূত্তমগন্ধবন্তং নদীসরঃপ্রস্রবণৌঘবন্তম্।
আজগ্মতুঃ কাঞ্চনধাতুমন্তং দেবর্ষিমন্তং হিমবন্তমাশু॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৪৮)

অর্থাৎ, হিমালয় পর্বতে তাঁরা দ্রুত চলে এলেন– যে স্থান ছিল দেবদারু বৃক্ষের উত্তম গন্ধে আমোদিত এবং সেখানে প্রবাহিত ছিল নদী, সরোবর ও প্রস্রবনের জলধারা, আরো ছিল স্বর্ণধাতু এবং অসংখ্য দেবর্ষি।

এছাড়াও হিমালয় পর্বতটি যে লতা, তরুকুঞ্জে, শ্যামল তৃণক্ষেত্র, নানা রকম ফুলে ফুলে আচ্ছাদিত ছিল সেই বিষয়েও সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যের প্রথম সর্গের ৬-৭ সংখ্যক শ্লোকে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। হিমালয়ের এই বন-বনানী এবং নৈসর্গিক পরিবেশকে তপস্বীদের শান্তি ও নীরবতার জন্য অপরিহার্য বলে কবি হিমালয়কে তপস্বীদের আশ্রম নির্মাণ উপযোগী পরিবেশ বলে উল্লেখ করেছেন। বন ও বন্য জীবের প্রতি অশ্বঘোষের প্রেম ও সমীহ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি বুদ্ধচরিতে উল্লেখ করেছেন:

ততো যযুর্মুদমতুলাং দিবৌকসো ববাশিরে ন মৃগগণা ন পক্ষিণঃ।
ন সস্বনুর্বনতরবোঽনিলাহতাঃ কৃতাসনে ভগবতি নিশ্চিতাত্মনি॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৬৮)

অর্থাৎ, দৃঢ় সংকল্প করে বুদ্ধ যখন জীবন-দর্শন খোঁজার জন্য নিঃশব্দে ধ্যানাসনে বসেন তখন দেবগণ অতুল আনন্দ লাভ করলেন। বনের পাখিরা কূজন করল না, পশুরা নীরব রইল, বায়ুতে আহত হয়েও বনের গাছ-পালা মর্মরধ্বনি বন্ধ করল।

বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের অষ্টম সর্গের ৩২ সংখ্যক শ্লোকেও সবুজ বন-বনানীর বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। কবি বুদ্ধচরিতের ত্রয়োদশ সর্গের ৬৮ সংখ্যক শ্লোকে বন-বনানীকে ভূ-পৃষ্ঠের উপন্যাস তথা জীবন কাহিনি বলে অভিহিত করেছেন।

৪.৩.২. গাছপালা: অশ্বঘোষের কাব্যে নানা রকম গাছপালারও উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নের ছকে বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ কাব্যে কোন কোন শ্লোকে কোন কোন গাছপালার কথা উল্লেখ আছে তা প্রদর্শন করা হলো:

বৃক্ষের নাম	মহাকাব্যের নাম, সর্গ এবং শ্লোক সংখ্যা	বৃক্ষের নাম	মহাকাব্যের নাম, সর্গ এবং শ্লোক সংখ্যা
নাগবৃক্ষ	সৌন্দরানন্দ: ৪র্থ সর্গ শ্লোক ১৮; ৭ম সর্গ শ্লোক ৯;	পারিজাত	সৌন্দরানন্দ: ১০ম সর্গ শ্লোক ২৬;
গন্ধপর্ণ	সৌন্দরানন্দ: ৭ম সর্গ শ্লোক ১০;	তমাল	সৌন্দরানন্দ: ৪র্থ সর্গ শ্লোক ২০;
দেবদারু	সৌন্দরানন্দ: ১০ম সর্গ শ্লোক ১৪;	তিলক	সৌন্দরানন্দ: ৭ম সর্গ শ্লোক ৭; বুদ্ধচরিত: ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৪৫;
শাল	সৌন্দরানন্দ: ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৩৩;	প্রিয়াঙ্গু	সৌন্দরানন্দ: ৭ম সর্গ শ্লোক ৬;

কদম্ব	সৌন্দরানন্দ: ১০ম সর্গ শ্লোক ১১;	মন্দরা বা কোরাল	সৌন্দরানন্দ: ১০ম সর্গ শ্লোক ২৬;
অশ্বত্থ	বুদ্ধচরিত: দ্বাদশ সর্গ শ্লোক ১১৫; ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ৭; সৌন্দরানন্দ: ৮ম সর্গ শ্লোক ৬;	কর্ণিকার	সৌন্দরানন্দ: অষ্টাদশ সর্গ শ্লোক ৫;
তালবৃক্ষ	বুদ্ধচরিত: ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ২৩;	অশোক	বুদ্ধচরিত: ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৪৭;
লোধ্র	বুদ্ধচরিত: ১০ম সর্গ শ্লোক ১৫; একাদশ সর্গ শ্লোক ৫;	অসিপত্র	বুদ্ধচরিত: চর্তুদশ সর্গ শ্লোক ১৫;
কুর্বক	বুদ্ধচরিত: ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৪৭;	আম	বুদ্ধচরিত: ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৩৫, ৪৪; চর্তুদশ সর্গ শ্লোক ৬;
চন্দন	বুদ্ধচরিত: ১ম সর্গ শ্লোক ২১; ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ৫৬; সৌন্দরানন্দ: পঞ্চদশ সর্গ শ্লোক ২৬;	জম্বু	বুদ্ধচরিত: ৫ম সর্গ শ্লোক ৮; দ্বাদশ সর্গ শ্লোক ১০১;

অশ্বঘোষ তাঁর কাব্যে ঋতুকালীন এবং বারোমাসি প্রচুর গাছপালার কথাও উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সৌন্দরানন্দ কাব্যে কবি বলেছেন:

ঋতাবৃতাবাকৃতিমেক একে ক্ষণে ক্ষণে বিভ্রতি যত্র বৃক্ষাঃ।
চিত্রাং সমস্তামপি কেচিদন্যে ষণ্ণামৃতূনাং শ্রিয়মুদ্বহন্তি ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৪৯)

অর্থাৎ, সেখানে কতগুলি গাছপালাতে প্রতিমুহূর্তেই ঋতুগত রূপ উদ্ভাসিত হয়, কতগুলিতে আবার ছয়টি ঋতুরই বিচিত্র সৌন্দর্য প্রকাশিত হচ্ছে।

একই সর্গের ২০-২৩ সংখ্যক শ্লোকে কবি স্বর্গের বর্ণনা দিতে গিয়ে অসাধারণ কাব্য প্রতিভায় স্বর্গীয় বনের গাছপালার সৌন্দর্য উপস্থাপন করেছেন। স্বর্গীয় বনের বর্ণনায় কবি বলেছেন– কোনো গাছে সুরভিত শোভন মালা, কোনো গাছে আবার সেই মালারই বিচিত্র রূপ, কোথাও আবার কর্ণের অলংকারের মতো ফুলের সমারোহ। কোনো কোনো গাছে রক্তবর্ণ সুন্দর পদ্ম প্রস্ফুটিত যেগুলো প্রদীপবৃক্ষের মতো শোভা পাচ্ছে। কোনো তরুতে নীলোৎপল শোভিত দেখে বৃক্ষের চোখ মনে হয়। কবি আরো উল্লেখ করেছেন সেখানকার গাছপালাগুলি ফলের মতই বিচিত্র বর্ণের বসন উৎপাদন করে, যাতে কোনো তন্তু নেই, সেলাই নেই, শুধুই শাদা-সোনালি রেখায় চিত্রিত। কবি বৃক্ষরাজির যে বর্ণনা প্রদান করেছেন তন্মধ্যে পারিজাত বৃক্ষকে বলা হয়েছে সমস্ত রাজকীয় বৈশিষ্ট্যের আধার। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন:

মন্দারবৃক্ষাংশ্চ কুশেশয়াংশ্চ পুষ্পানতান্ কোকনদাংশ্চ বৃক্ষান্।
আক্রম্য মাহাত্ম্যগুণৈর্বিরাজন্ রাজায়তে যত্র স পারিজাতঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৫০)

অর্থাৎ, সেখানে পারিজাত বৃক্ষ সর্বপ্রকার মহিমায় বিভূষিত, মান্দার বৃক্ষ এবং অন্যান্য বৃক্ষে যেখানে পদ্ম এবং রক্তোৎপল ফুটে আছে– তাদের উপরে পারিজাত যেন রাজা, এমনি তার ভাব।

ফল-ফুলে ভরপুর বনের গাছপালার কথা কবি মহাকাব্যদ্বয়ে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যের প্রথম সর্গের ৯ সংখ্যক শ্লোকে আশ্রমের বৃক্ষরাজি পর্যাপ্ত ফুল-ফলে সজ্জিত ছিল বলে কবি

উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে বৃক্ষের বর্ণনায় কবি বুদ্ধচরিতের ত্রয়োদশ সর্গের ৪০ সংখ্যক শ্লোকে পর্বত চূড়ার সমান বিশাল বৃক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধচরিতের চতুর্দশ সর্গের ১৫ সংখ্যক শ্লোকে 'অসিপত্র' নামক এক বনের কথা উল্লিখিত আছে। অবসন্ন হয়ে শীতল ছায়ার অভিলাষীকে কবি অসিপত্রের কাছে গমনের কথা বলেছেন।

ফুল-ফল সমেত বন-বনানীর কথা ছাড়াও কবি কিছু বিশেষ ফল বৃক্ষের কথা বলেছেন। বুদ্ধচরিত কাব্যের চতুর্থ সর্গের ৩৫ ও ৪৪ সংখ্যক শ্লোক এবং চর্তুদশ সর্গের ৬ সংখ্যক শ্লোক পাঠে মনে হয় আম বৃক্ষ খুব সম্ভবত কবির প্রিয় বৃক্ষ ছিল। তবে তিনি কলা এবং জম্বরের কথাও বলেছেন বুদ্ধচরিত কাব্যের দ্বাদশ সর্গের ১০১ সংখ্যক শ্লোকে। বদরী ফল ও তিলের বর্ণনা পাওয়া যায় বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গের ৯৬ সংখ্যক শ্লোকে। শ্লোকটিতে কবি বলেছেন:

অন্নকালেষূ চৈকৈকৈঃ স কোলতিলতণ্ডুলৈঃ।
অপারপারসংসারপারং প্রেপ্সুরপরায়ৎ ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৬৬)

অর্থাৎ, পারহীন সংসারের পারপ্রাপ্তির ইচ্ছায় তাপস্যার সময় তিনি (বোধিসত্ত পরে বুদ্ধ) আহারকালে একটি মাত্র বদরী (কুল ফল), তিল ও তণ্ডুলকণা গ্রহণ করতে লাগলেন।

মহাকবি অশ্বঘোষ সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে জ্বালানী বৃক্ষ বা জ্বালানী কাঠের বর্ণনা দিয়েছেন কাব্যিক ভঙ্গিমায়। কবি এ কথাও জানিয়েছেন শুকনো কাঠের নিরবচ্ছিন্ন ঘর্ষণে বনে কখনো কখনো আগুন প্রজ্জ্বলিত হতো। সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে উক্ত বিষয়ে উল্লেখ করেছেন এভাবে:

অনিক্ষিপ্তোৎসাহো যদি খনতি গাং বারি লভতে
প্রসক্তং ব্যামথ্নন্ জ্বলনমরণিভ্যাং জনয়তি।
প্রযুক্তা যোগে তু ধ্রুবমুপলভন্তে শ্রমফলং
দুত্যং নিত্যং যান্তো গিরিমপি হি ভিন্দতি সরিতঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৭৬)

অর্থাৎ, উৎসাহী হয়ে যদি কেউ মাটি খনন করে তবে সে জল পায়, তেমনি অনবরত অরণি ঘর্ষণ করতে করতে অগ্নি উৎপাদন করা যায়, তদ্রুপ যারা যোগ সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করে তারাও তাদের পরিশ্রমের ফল পায়, কেননা জলধারা নিত্য দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকলে পর্বতকেও ক্ষয় করতে পারে।

৪.৩.৩. ঝোঁপ-ঝাড়, লতাগুল্ম, ঘাস: মহাকবি অশ্বঘোষ বড় বৃক্ষের পাশাপাশি ঝোঁপ-ঝাড়, লতাগুল্ম, ঘাস প্রভৃতির বর্ণনাও মহাকাব্যদ্বয়ে উপস্থাপন করেছেন। বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গের ৪৯ সংখ্যক শ্লোকে কবি 'সিন্ধুবারা' নামে এক ধরনের ঝোঁপ-ঝাড়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

দীর্ঘিকাং প্রাবৃতাং পশ্য তীরজৈঃ সিন্ধুবারকৈঃ।
পাণ্ডুরাংশুকসংবীতাং শয়ানাং প্রমদামিব ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১২৭)

অর্থাৎ, তীরে উৎপন্ন সিন্ধুবারপুষ্পে আচ্ছাদিত এই দীঘি দেখুন, মনে হচ্ছে যেন শুভ্র বসনে আবৃত হয়ে কোন রমনী শুয়ে আছে।

ফুল সহকারে লতাগুল্মের উল্লেখ পাওয়া যায় সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যের দশম সর্গের ১৩ সংখ্যক শ্লোকে। এছাড়ও সৌন্দরানন্দ কাব্যে পুষ্প সমৃদ্ধ অতিমুক্ত লতার কথা কবি ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

লতাং প্রফুল্লামতিমুক্তকস্য চূতস্য পার্শ্বে পরিরম্ভ্য জাতাম্।
নিশাম্য চিন্তামগমত্তদৈবং শ্লিষ্টাভবন্ মামপি সুন্দরীতি ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৩৮)

অর্থাৎ, তিনি দেখলেন একটি কুসুমিতা অতিমুক্তলতা আম্রবৃক্ষকে জড়িয়ে উঠেছে। তিনি তখন ভাবলেন– কবে সুন্দরী তাকে এভাবে আমাকে আলিঙ্গন করবে?

সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যের অষ্টম সর্গের ৮ সংখ্যক শ্লোকে অশ্বঘোষ এমন এক সৌন্দর্যমণ্ডিত বাগানের বর্ণনা দিয়েছেন যা ফুল সমৃদ্ধ লতাগুল্মে পূর্ণ হয়ে নিকুঞ্জ তৈরি করেছে এবং তা পথিকদের জন্য আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। লতাগুল্মের নানা ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা কবি মহাকাব্যদ্বয়ে নানাভাবে উল্লেখ করেছেন। সৌন্দরানন্দ কাব্যের অষ্টম সর্গের ৩১ সংখ্যক শ্লোকে কিছু কিছু বিষাক্ত লতাগুল্মে কথা বর্ণিত আছে। আবার বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের অষ্টম সর্গের ৫৯ সংখ্যক শ্লোকে কিছু কিছু লতাগুল্মের ফুল হতে মধু ঝরার কথা কবি উল্লেখ করেন। একাদশ সর্গের ৬৮ সংখ্যক শ্লোকে লতাগুল্মকে কবি চঞ্চল এবং সর্বগামী বলে অভিহিত করেছেন।

ঘাস বা তৃণ এক ধরনের সপুষ্পক উদ্ভিদকে বোঝায়। বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গের ১ সংখ্যক শ্লোকে ঘাসকে বলা হয়েছে 'শাদ্বল'। এ প্রসঙ্গে কবি উল্লেখ করেছেন:

ততঃ কদাচিন্মৃদুশাদ্বলানি পূংস্কোকিলোন্নাদিতপাদপানি।
শুশ্রাব পদ্মাকরমণ্ডিতানি গীতৈর্নিবদ্ধানি স কাননানি ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১১৯)

অর্থাৎ, অতপর কোনো এক সময়ে তিনি গীতমুখরিত কাননের কথা শুনতে পেলেন– কানন ছিল পদ্মপূর্ণ সরোবরে শোভিত, স্নিগ্ধ সবুজ তৃণ বা ঘাসে ঢাকা, আর গাছে গাছে কোকিলের কূজন।

বুদ্ধচরিতের পঞ্চম সর্গের ৯ সংখ্যক শ্লোকে কবি সবুজ ঘাসকে মূল্যবান বৈদূর্যমণির সাথে তুলনা করেছেন। মহাকাব্যদ্বয়ে উল্লেখিত ঘাসের মধ্যে কুস এবং দুর্বা ছিল অন্যতম। ঋগ্বেদেও (X. 134.5, 142.8) এই দুর্বা ঘাসের কথা উল্লেখিত আছে যা দেবতাদের অর্ঘ্য প্রদানে ব্যবহৃত হতো। খাবার উপযোগী ঘাসের কথাও কবি ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে বুদ্ধ দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হওয়ায় পূর্বে এক তৃণচ্ছেদকের কাছ থেকে পবিত্র তৃণ গ্রহণ করেছিলেন বলে কবি বুদ্ধচরিতের দ্বাদশ সর্গের ১১৯ সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ করেছেন।

৪.৩.৪. ফুল: ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক। আধ্যাত্মিক বস্তু বা ধর্মীয় কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও বটে। ফুলকে আবার ভালবাসার প্রকাশ মাধ্যম হিসেবেও গণ্য করা হয়। কালে কালে কবি সাহিত্যিকগণ লেখার উপাদান বা বিষয়বস্তু হিসেবে ফুলের বর্ণনা নানাভাবে তুলে ধরেছেন। মহাকবি অশ্বঘোষের মহাকাব্যদ্বয়েও বিভিন্ন ফুলের বর্ণনা পাওয়া যায় যেগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হতো। নিচের ছকে মহাকাব্যদ্বয়ের কোন কোন সর্গের কোন কোন শ্লোকে কোন কোন ফুলের বর্ণনা রয়েছে তা উপস্থাপন করা হলো:

ফুলের নাম	**মহাকাব্যের নাম, সর্গ এবং শ্লোক সংখ্যা**	**ফুলের নাম**	**মহাকাব্যের নাম, সর্গ এবং শ্লোক সংখ্যা**
সিতপুষ্প	বুদ্ধচরিত: ১ম সর্গ শ্লোক ৮৬;	মন্দার	বুদ্ধচরিত: ১ম সর্গ শ্লোক ১৯; চতুর্দশসর্গ শ্লোক ৮৯;
মাধবী	বুদ্ধচরিত: ৭ম সর্গ শ্লোক ৪; সৌন্দরানন্দ: ১ম সর্গ শ্লোক ১২;	কর্ণকার	বুদ্ধচরিত: ৫ম সর্গ শ্লোক ৩, ৫১;
আমের মুকুল	বুদ্ধচরিত: ৩য় সর্গ শ্লোক ১, ২৪; ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৩৫, ৪১, ৪৪; ৭ম সর্গ শ্লোক ১১;	কোপর বা জাফরান	সৌন্দরানন্দ: ১ম সর্গ শ্লোক ৭;

পদ্ম	সৌন্দরানন্দ: ১ম সর্গ শ্লোক ৮; ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৩২; ৬ষ্ঠ সর্গ শ্লোক ২৬; ৭ম সর্গ শ্লোক ১১, ২৩; ১০ম সর্গ শ্লোক ২০, ৩৭; ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ৫; বুদ্ধচরিত: ১ম সর্গ শ্লোক ২১;	রক্তোৎপল	সৌন্দরানন্দ: ১০ম সর্গ শ্লোক ২৬;

উল্লিখিত ফুলের মধ্যে কবি সিতপুষ্পকে সাদা রঙের ফুল এবং এই সুন্দর ফুল সাজ-সজ্জার কাজে ব্যবহৃত হতো বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন অর্ঘ্য প্রদানের জন্য মাধবী ফুল এবং মন্দার ফুল ব্যবহার করা হতো। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধচরিত কাব্যে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

মহোরগা ধর্মবিশেষতর্ষাদ্ বৃদ্ধেষ্বতীতেষু কৃতাধিকারাঃ।
যমব্যজন্ ভক্তিবিশিষ্টনেত্রা মন্দারপুষ্পৈঃ সমবাকিরংশ্চ ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১১১)

অর্থাৎ, যে সমস্ত বৃহদাকার সর্প অতীত বুদ্ধগণের সেবার অধিকার পেয়েছিলেন তাঁরা বিশেষ ধর্মের তৃষ্ণায় তাঁকে বীজন করেছিলেন এবং ভক্তিপূত নয়নে তাঁর উপর বর্ষণ করেছিলেন মন্দার পুষ্প।

এছাড়াও কবি বুদ্ধচরিতে আমের মুকুলকে বিশেষ সুগন্ধময় ফুল এবং ঈশ্বরের প্রেমের ফুল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এই ফুলের সুগন্ধে কোকিল পাখিও আকৃষ্ট হতো। সাধারণত সুগন্ধিযুক্ত ফুল দিয়ে ফুলের মালা তৈরি করা হতো বলে কবি উভয় মহাকাব্যে উল্লেখ করেছেন। পদ্মফুলের কথা কবি বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ উভয় মহাকাব্যে উল্লেখ করেছেন। পদ্ম হলো মন ও আত্মার শুদ্ধতার প্রতীক। পদ্মফুল বৌদ্ধধর্মে বিশেষ করে মহাযান ধর্ম দর্শনে একটি উল্লেখযোগ্য ফুলের নাম। প্রস্ফুটিত পদ্ম জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রার্থনায়, পারমী পূর্ণতায় এবং সংকল্পের প্রতীক হিসেবেও পদ্মের ব্যবহার মহাযান ধর্ম দর্শনে পরিলক্ষিত হয়। কবি তাঁর কাব্যের উপমায় পদ্ম ফুলের রং-রূপকে তুলে ধরেছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এ প্রসঙ্গে কবি সৌন্দরানন্দ কাব্যে নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন:

বৈডূর্যনালানি চ কাঞ্চনানি পদ্মানি বজ্রক্ষুরকেসরাণি।
স্পর্শক্ষমাণ্যুত্তমগন্ধবন্তি রোহন্তি নিষ্কম্পতলা নলিন্যঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৫০)

অর্থাৎ, পদ্মসরোবরগুলির উপরিভাগ প্রশান্ত, তাতে স্বর্ণপদ্ম ফুটে থাকে, সেই সোনালি বর্ণের পদ্মের সবুজ কাণ্ড থাকে, হীরার কেশর থাকে, সুগন্ধযুক্ত এ পদ্মফুল স্পর্শ করলে পরমানন্দ পাওয়া যায়।

৪.৪. প্রাণী

মহাকবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে আকাশ, ভূমি এবং পানিতে বসবাসকারী এবং বিচরণকারী বিভিন্ন প্রাণিকূলের কথাও উল্লেখ করেছেন। কবি হিংস্র বন্যপ্রাণী এবং গৃহপালিত ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নের ছকে মহাকাব্যদ্বয়ের কোন কোন সর্গের কোন কোন শ্লোকে কোন কোন প্রাণীর বর্ণনা রয়েছে তা উপস্থাপন করা হলো:

প্রাণীর নাম	**মহাকাব্যের নাম, সর্গ এবং শ্লোক সংখ্যা**	**প্রাণীর নাম**	**মহাকাব্যের নাম, সর্গ এবং শ্লোক সংখ্যা**
সিংহ	**সৌন্দরানন্দ:** ১ম সর্গ শ্লোক ১৯; ১০ম সর্গ শ্লোক ৯; **বুদ্ধচরিত:** ১ম সর্গ শ্লোক ১৫; ৫ম সর্গ শ্লোক	বাঘ	**সৌন্দরানন্দ:** ১ম সর্গ শ্লোক ৩৭; ৮ম সর্গ শ্লোক ৬১; ১০ম সর্গ শ্লোক

	১,২৬; ৯ম সর্গ শ্লোক ১৭; ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ৩৩;		১০; পঞ্চদশ সর্গ শ্লোক ৫৩; **বুদ্ধচরিতঃ** ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ১৯;
শার্দুল	**সৌন্দরানন্দঃ** ১০ম সর্গ শ্লোক ১২;	ভালুক	**বুদ্ধচরিতঃ** ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ১৯;
মেষ	**সৌন্দরানন্দঃ** একাদশ সর্গ শ্লোক ২৫;	ষাঁড়	**সৌন্দরানন্দঃ** ১০ম সর্গ শ্লোক ১১;
হাতি	**সৌন্দরানন্দঃ** ১ম সর্গ শ্লোক ৩৪, ৩৬, ৫২; ২য় সর্গ শ্লোক ৫০; ৩য় সর্গ শ্লোক ১; ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৪০; ৫ম সর্গ শ্লোক ৫৩; ৬ষ্ঠ সর্গ শ্লোক ২৪; ৭ম সর্গ শ্লোক ৪; ৮ম সর্গ শ্লোক ১৬; দ্বাদশ সর্গ শ্লোক ১১; **বুদ্ধচরিতঃ** ২য় সর্গ শ্লোক ১, ৩, ২২; ৪র্থ সর্গ শ্লোক ২৭; ৫ম সর্গ শ্লোক ২৯, ৫৮, ৮২; ৯ম সর্গ শ্লোক ২৭; ১০ম সর্গ শ্লোক ২১; ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ১৯, ২১, ২৪; চতুর্দশ সর্গ শ্লোক ২১,২৪,৫৩;	ঘোড়া	**বুদ্ধচরিতঃ** ২য় সর্গ শ্লোক ১, ৪, ২২; ৩য় সর্গ শ্লোক ৮; ৫ম সর্গ শ্লোক ৩, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৯; ৬ষ্ঠ সর্গ শ্লোক ৩, ৪, ৫৩; ৮ম সর্গ শ্লোক ১, ১৯, ৪৫; ৯ম সর্গ শ্লোক ১; **সৌন্দরানন্দঃ** ১ম সর্গ শ্লোক ৫২; ৩য় সর্গ শ্লোক ১, ২০; ১০ম সর্গ শ্লোক ৪১; দ্বাদশ সর্গ শ্লোক ৫, ২২;
উট	**বুদ্ধচরিতঃ** ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ১৯;	গরু	**বুদ্ধচরিতঃ** ১ম সর্গ শ্লোক ৮৪; ২য় সর্গ শ্লোক ৫; ৭ম সর্গ শ্লোক ৬; ৯ম সর্গ শ্লোক ২৬; ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ৩৩; চতুর্দশ সর্গ শ্লোক ২৩; **সৌন্দরানন্দঃ** অষ্টাদশ সর্গ শ্লোক ১১;
মহিষ	**বুদ্ধচরিতঃ** ৮ম সর্গ শ্লোক ২৪;	ভেড়া	**বুদ্ধচরিতঃ** ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ২৩;
শুকর	**সৌন্দরানন্দঃ** ৮ম সর্গ শ্লোক ৬০;	গাধা	**বুদ্ধচরিতঃ** ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ১৯;
হরিণ	**বুদ্ধচরিতঃ** ১ম সর্গ শ্লোক ২৬; ৬ষ্ঠ সর্গ শ্লোক ৬০; ৭ম সর্গ শ্লোক ২, ৫, ১৫; একাদশ সর্গ শ্লোক ৪৫; **সৌন্দরানন্দঃ** ১ম সর্গ শ্লোক ১২, ১৩; ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৩৯; ১০ম সর্গ শ্লোক ১৬; ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ৩৬;	কুকুর	**বুদ্ধচরিতঃ** চতুর্দশ সর্গ শ্লোক ১৪; একাদশ সর্গ শ্লোক ২৫; দ্বাদশ সর্গ শ্লোক ১৪; **সৌন্দরানন্দঃ** ৮ম সর্গ শ্লোক ২১; ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ৩৯;
বিড়াল	**বুদ্ধচরিতঃ** ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ২৩;	বানর	**বুদ্ধচরিতঃ** ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ২১; **সৌন্দরানন্দঃ** ১০ম সর্গ শ্লোক ১৪, ১৫, ১৬, ১৭;
সাপ	**বুদ্ধচরিতঃ** ৭ম সর্গ শ্লোক ৫, ১৫, ৩৭; ৯ম সর্গ শ্লোক ৪৩; একাদশ সর্গ শ্লোক ৮, ২৪, ৫২; ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ৩০, ৫০;	পিঁপড়া	**বুদ্ধচরিতঃ** ৭ম সর্গ শ্লোক ১৫;

	সৌন্দরানন্দঃ ১ম সর্গ শ্লোক ৩৮; ২য় সর্গ শ্লোক ২২; ৩য় সর্গ শ্লোক ৩; ৫ম সর্গ শ্লোক ৩১; ৮ম সর্গ শ্লোক ১৮, ৩১, ৬১; ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ৩১;		
কুমির	**বুদ্ধচরিতঃ** ৯ম সর্গ শ্লোক ৪১; **সৌন্দরানন্দঃ** ৮ম সর্গ শ্লোক ১৭, ৩৭;	মাছ	**বুদ্ধচরিতঃ** একাদশ সর্গ শ্লোক ৩৫; ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ১১, ১৯;
হাঁস	**বুদ্ধচরিতঃ** ৭ম সর্গ শ্লোক ৫৭; **সৌন্দরানন্দঃ** ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৪;	কচ্ছপ	**সৌন্দরানন্দঃ** অষ্টাদশ সর্গ শ্লোক ২৭;
ময়ূর	**সৌন্দরানন্দঃ** ১ম সর্গ শ্লোক ১১; ৭ম সর্গ শ্লোক ১১; **বুদ্ধচরিতঃ** ৭ম সর্গ শ্লোক ৫০; ১০ম সর্গ শ্লোক ১৫;	কোকিল	**বুদ্ধচরিতঃ** ৩য় সর্গ শ্লোক ১; ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৪৪, ৫১; **সৌন্দরানন্দঃ** ৪র্থ সর্গ শ্লোক ৫১; ৭ম সর্গ শ্লোক ১১, ২৩;
পায়রা	**সৌন্দরানন্দঃ** ৬ষ্ঠ সর্গ শ্লোক ৮, ৩০;	কাক	**বুদ্ধচরিতঃ** ত্রয়োদশ সর্গ শ্লোক ৫৪; চতুর্দশ সর্গ শ্লোক ১৪;

উল্লিখিত প্রাণীকূলের মধ্যে কবি সিংহ, বাঘ, শার্দুল এবং ভালুককে হিংস্র বণ্য পশু বলে অভিহিত করেছেন। অপরদিকে কবি হাতির কথা উল্লেখ করেছেন দ্বীপ, দ্বীপেন্দ্র, দ্বিরদ, গজেন্দ্র, ঐরাবত প্রভৃতি নামে। বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ২, ৩ এবং ২২ সংখ্যক শ্লোকে হিমালয়ের ঘন জঙ্গলে বিচরণকারী এবং রাজকীয় বাহন হিসেবে হাতির উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সাথে হাতির রয়েছে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। মহামানব বুদ্ধের জন্মের প্রতীক হিসেবে হাতিকে বৌদ্ধরা শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। বুদ্ধ মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণের সময় মাতা মহামায়া স্বপ্ন দেখেন যে এক তেজোময় শ্বেতহস্তী জঠরে প্রবেশ করেন। বুদ্ধের জন্মের ঘটনা বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি অশ্বঘোষ সৌন্দরানন্দ কাব্যে হাতির কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে:

স্বপ্নেহথ সময়ে গর্ভভাবিশন্তং দদর্শ সা।
ষড়ুদগুং বারণং দ্বৈতমৈরাবতমিবৌজসা ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১২৪)

অর্থাৎ, যথাকালে তিনি (মহামায়া) স্বপ্নে দেখলেন ঐরাবতের মত তেজোময় এক ষট্ দন্তী হস্তী তাঁর গর্ভে প্রবেশ করছে।

কবি অশ্বঘোষ ঘোড়াকে বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে তুর্গ, তুরঙ্গ, অশ্ব, বাজিবর, হয় প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। অশ্ব কন্থককে সাথে করে সিদ্ধার্থ গৌতম যে গৃহত্যাগ করেন সে ঘটনার বর্ণনা কবি বুদ্ধচরিতের পঞ্চম সর্গের ৩ সংখ্যক শ্লোকে উপস্থাপন করেছেন। কবি অশ্ব কন্থককে অশ্বশ্রেষ্ঠ বলেও অভিহিত করেন। সাধারণত অশ্ব যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কবি চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে ঘোড়া বা অশ্বের সাথে তুলনা করে সৌন্দরানন্দ কাব্যে এরূপ ব্যক্ত করেছেন:

স জাততর্ষোহল্পরসঃ পিপাসুস্তৎপ্রাপ্তয়েহ ধিষ্ঠিতবিক্লবার্তঃ।
লোলেন্দ্রিয়াশ্বেন মনোরথেন জেহ্রীয়মাণো ন ধৃতিং চকার ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৫১)

অর্থাৎ, তাঁর মনে তৃষ্ণা জেগেছে। তিনি অপ্সরা পিপাসু কিন্তু তিনি তাদের পাওয়ার নৈরাশ্যে ক্লিষ্ট হচ্ছিলেন। মন তাঁর রথ, চঞ্চল ইন্দ্রিয় হল তাঁর অশ্ব। কামনায় তিনি উদ্ভ্রান্ত ছিলেন, তাই তিনি নিজেকে সংযত করতে পারছিলেন না।

গৃহপালিত জন্তু হিসবে গরু আমাদের কাছে খুবই পরিচিত একটি প্রাণী। বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যে গরুর বর্ণনাও পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। যেমন, বুদ্ধচরিতের সপ্তম সর্গের ৬ সংখ্যক শ্লোকে গরুর দুধকে পবিত্র এবং নৈবেদ্য নিবেদনের ক্ষেত্রে গরু ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। একই মহাকাব্যে আরো উল্লেখ আছে:

পুষ্টাশ্চ তুষ্টাশ্চ তথাস্য রাজ্যে সাধ্ব্যোহরজস্কা গুণবৎপয়স্কাঃ।
উদগ্রবৎসৈঃ সহিতা বভূবুর্বহ্ব্যা বহুক্ষীরদুহশ্চ গাবঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১১৬)

অর্থাৎ, রাজ্যে এলো বহু গাভী, গাভীগুলো ছিল পুষ্ট, প্রসন্ন, শান্ত ও অমলিন; এদের দুগ্ধ ছিল গুণময়, বৎসগুলি ছিল সরল। গাভীগুলো ছিল প্রচুর দুগ্ধের ভাণ্ডার।

এছাড়াও জমি কর্ষণের জন্য এবং বাহন হিসেবে বৃষ বা ষাঁড় ব্যবহারের কথা কবি বুদ্ধচরিতের পঞ্চম সর্গের ৬ সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ করেছেন।

মহাকবি অশ্বঘোষ তাঁর মহাকাব্যদ্বয়ে নানা জাতের সর্প বা সাপের বর্ণনা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ভুজঙ্গ, ব্যালা, উর্গ, কৃষ্ণ, ইত্যাদি। ভুজঙ্গ এবং কৃষ্ণ সর্পকে বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের নবম সর্গের ৪৩ সংখ্যক শ্লোক এবং একাদশ সর্গের ২ সংখ্যক শ্লোকে সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সাপকে অত্যন্ত রাগী বা ক্রোধপরায়ণ প্রাণী হিসেবে উল্লেখ করে কবি বুদ্ধচরিতে বলেছেন:

অনাত্মবন্তো হৃদি যৈর্বিদষ্টা বিনাশমর্ছন্তি ন যান্তি শর্ম।
ক্রুদ্ধোগ্রসর্প প্রতিমেষূ তেষূ কামেষূ কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥ (প্রসূন, ১৯৮৯: ১৫৮)

অর্থাৎ, অসংযমীগণ যাদের দ্বারা আহত হয়ে শান্তিলাভ না করে অশান্তি বা ধ্বংসলাভ করে সেই ক্রুদ্ধ উগ্র সাপের মতো বিষয়গুলিতে কোন্ সংযমী পুরুষের আনন্দ হবে।

তবে এই রাগী প্রাণীকেও নিজের আয়ত্বে আনা বা বশ করা যায় বলে কবি সৌন্দরানন্দ কাব্যের পঞ্চম সর্গের ৩১ সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সর্প বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তির কাছে ঔষধ থাকার কারণে সাপ দংশন করতে পারে না; তেমনি সংসারের মোহ জয়ী ব্যক্তিকে শোকের সর্প দংশন করতে পারে না।

কবি মহাকাব্যদ্বয়ে হিংস্র ও গৃহপালিত প্রাণীর পাশাপাশি নানা রকম পাখির কথাও উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোকিলকে সুরেলা কণ্ঠের পাখি বলে অভিহিত করেছেন। পালিত পায়রা সাধারণত প্রাসাদশীর্ষে আবাস গড়ত বলে কবি উল্লেখ করেছেন। কবি করণ্ডব এবং চক্রবাক নামে দুটি জলজ পাখির কথা বলেছেন। এগুলো মূলত হাঁসজাতীয় পাখি। সৌন্দরানন্দ কাব্যের দশম সর্গের ২৮ সংখ্যক শ্লোকে কবি লাল ঠোঁট, স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো চোখ, বাদামি রঙের ডানা, রক্তবর্ণ পা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিছু স্বর্গীয় পাখির বর্ণনা করেছেন।

৪.৫. ঋতুবৈচিত্র্য

প্রকৃতির বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য প্রকৃতি পাগল মানুষের মনে ভাবের উন্মেষ ঘটায়। এই প্রকৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ঋতুবৈচিত্র্য। যুগে যুগে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যে ঋতুবৈচিত্র্যের কথা

উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যেও এর প্রভাব কম নয়। মধ্যযুগের কবি বড়ু-চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে দয়িতার ভালোবাসার গভীরতাকে বোঝাতে কবি ঋতু বৈচিত্রের প্রভাবের কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে প্রভাব সঞ্চারী এদেশের ষড়ঋতুর বিকাশ বৈচিত্র্যকে চমৎকার কাব্যরূপ দিয়েছেন (মোঃ সাইদুজ্জামান, ৬ নভেম্বর ২০১৫: *দৈনিক জনকণ্ঠ*)। একইভাবে প্রাচীন যুগের মহাকবি অশ্বঘোষও তাঁর মহাকাব্য দুটিতে ছয় ঋতুর বর্ণনা বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

মহাকবি বসন্তকে ফুলের ঋতু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ ঋতুর সাথে যে কামোদ্দীপ্ততার সম্পর্ক রয়েছে তা নির্দেশ করেছেন বুদ্ধচরিতের চতুর্থ সর্গের ৫২ এবং ৫৩ সংখ্যক শ্লোকে। কবি সৌন্দরনন্দ কাব্যে বসন্তকে পুষ্প মাস হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন:

স পুষ্পমাস্য চ পুষ্পলক্ষ্ম্যা সর্বাভিসারেণ চ পুষ্পকেতোঃ।
যানীয়ভাবেন চ যৌবনস্য বিহারসংস্থো ন শমং জগাম ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৩৭)

অর্থাৎ, বসন্তে পুষ্পের সমারোহ, পুষ্পকেতু মদনদেবতা তাঁকে সব দিক থেকে আক্রমণ করে চলেছেন, প্রাণে যৌবনোচিত অনুভূতি, তাঁর মনে কোন শান্তি ছিল না।

বুদ্ধচরিতের পঞ্চম সর্গের ৩৫, ৪১ এবং ৪৪ সংখ্যক শ্লোক এবং অষ্টম সর্গের ৬ সংখ্যক শ্লোকে বসন্তের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন, এই সময়ে আম গাছে আমের মুকুল আসে, সরোবরে পদ্ম ফুটে, সুমিষ্ট বাতাস বয়ে যায়। বসন্তে চারপাশের প্রতিটি প্রাকৃতিক উপাদান যেন নতুনরূপে সাজে। এ প্রসঙ্গে কবি সৌন্দরানন্দ কাব্যে আরো বলেছেন–

ঋতাবৃতাবাকৃতিমেক একে ক্ষণে ক্ষণে বিভ্রতি যত্র বৃক্ষাঃ।
চিত্রাং সমস্তামপি কেচিদন্যে ষণ্ণামৃতূনাং শ্রিয়মুদ্বহন্তি ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৪৯)

অর্থাৎ, প্রতিমুহূর্তেই বৃক্ষে বৃক্ষে ঋতুগত রূপ উদ্ভাসিত, কতগুলিতে আবার ছয়টি ঋতুরই বিচিত্র সৌন্দর্য প্রকাশিত হচ্ছে।

কবি গ্রীষ্মকালকে নিদাঘকাল বলে অভিহিত করেছেন। জুন-জুলাই মাস তথা বাংলা পঞ্জিকার জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাস এই নিদাঘকালের অন্তর্গত। কবি মহাকাব্যদ্বয়ে উপমার প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালের বর্ণনা দিয়েছেন। সৌন্দরানন্দ মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গের ২৮ সংখ্যক শ্লোকে এই ঋতুটিকে অশ্বঘোষ রৌদ্রতপ্ত ঋতু বলে অভিহিত করেছেন।

কবি মহাকাব্যদ্বয়ে নানাভাবে বর্ষাঋতুর কথা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করে এবং বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করে কবি সুনিপুণভাবে বর্ষার নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির ফলে যে বন্যার প্রাদুর্ভাব হয় তার বর্ণনা পাওয়া যায় সৌন্দরানন্দ কাব্যে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন:

বুদ্ধস্ততস্তত্র নরেন্দ্রমার্গে স্রোতো মহদ্ভক্তিমতো জনস্য।
জগাম দুঃখেন বিগাহমানো জলাগমে স্রোত ইবাপগায়াঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৩১)

অর্থাৎ, রাজপথে সেই ভক্তিবিহ্বল বিশাল জনস্রোত ভেদ করে বুদ্ধ অগ্রসর হতে লাগলেন। যেতে কষ্ট হচ্ছিল, তিনি যেন বর্ষাগমে বিপুল নদী স্রোত ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন।

কবি বুদ্ধচরিতের নবম সর্গের ১৫ সংখ্যক শ্লোকে শোকাবেগকে বর্ষাকালের নদীর তীব্র স্রোতের সাথে তুলনা করেছেন। বর্ষায় স্রোতের কারণে নদীর কূল যেমন ভেঙে পড়ে তেমনি শোকাবেগ বা শোকানুভূতি মানব মনকে আহত করে। কবি বর্ষাঋতুর সহজাত বৈশিষ্ট্য আকাশে কালো মেঘ জমা, ভারী বর্ষণ,

ঝড়ো হাওয়া, ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ প্রভৃতির কথা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। বর্ষাঋতুর আরেক বৈশিষ্ট্য বজ্রপাতের কথা কবি *সৌন্দরানন্দ* কাব্যে উল্লেখ করেছেন এভাবে:

আতপ্তবুদ্ধেঃ প্রহিতাত্মনোঽপি স্বভ্যস্তভাবাদ্ধ কামসংজ্ঞা।
পর্যাকুলং তস্য মনশ্চকার প্রাবৃট্সু বিদ্যুজ্জলমাগতেব ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৭৭)

অর্থাৎ, মনের উৎসাহ এবং আত্মার সংকল্প সত্ত্বেও নিজের অভ্যাসবশে কামভাব তাঁর মনকে ব্যাকুল করে তুললো– বর্ষাকালে জলের মধ্যে বজ্রপাত হয়ে যেমন জলকে অশান্ত করে তোলে।

স্নিগ্ধ শরৎকালের কথাও কবি মহাকাব্যদ্বয়ে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। শরৎকালের স্নিগ্ধতা এক কথায় অসাধারণ। জলহারা শুভ্র মেঘের দল যখন নীল, নির্জন, নির্মল আকাশে পদসঞ্চার করে, তখন আমরা বুঝতে পারি শরৎ এসেছে। মূলত ভাদ্র-আশ্বিন হলো শরৎকালের ব্যাপ্তি। শরৎকালের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, আলো-ছায়ার খেলার চিত্রকে কবি *সৌন্দরানন্দ* কাব্যে ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

তাভির্বৃতা হর্ম্যতলেঽঙ্গনাভিশ্চিন্তাতনুঃ সা সুতনুর্বভাষে।
শতহ্রদাভিঃ পরিবেষ্টিতেব শশাঙ্কলেখা শরদভ্রমধ্যে ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৩৬)

অর্থাৎ, চিন্তায় ক্ষীণ তার সুকুমার সৌন্দর্য প্রাসাদশীর্ষে এই নারীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে শরৎকালে বিদ্যুৎ বেষ্টিত চন্দ্রলেখার মতো প্রতিভাত হল।

শরৎকালের পর হেমন্ত ঋতুর আগমন হয়। এর পরেই আসে শীতকাল। তাই হেমন্তকে বলা হয় শীতের পূর্বাভাস। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস জুড়েই হেমন্ত ঋতু বর্তমান থাকে। শীতকালকে বলা হয় সবচেয়ে শীতল ও শুষ্ক সময়। মাঘ-ফাগুন মাস এই শীত ঋতুর সময়। মহাকবি অশ্বঘোষ সুনির্দিষ্টভাবে এই দুই ঋতুর কথা তাঁর মহাকাব্যে উল্লেখ করেননি। তবে সৌন্দরানন্দ কাব্যের দশম সর্গের ১৯ সংখ্যক শ্লোকে কবি বিচিত্র সৌন্দর্যমণ্ডিত ছয়টি ঋতুর বিষয় উপস্থাপন করেছেন এবং একই মহাকাব্যে শীত ঋতুর আভাস প্রদান করেছেন এভাবে:

তামঙ্গনাং প্রেক্ষ্য চ বিপ্রলব্ধা নিশ্বস্য ভূয়ঃ শয়নং প্রপেদে।
বিবর্ণবক্ত্রা ন ররাজ চাশু বিবর্ণচন্দ্রেব হিমাগমে দ্যৌঃ ॥ (প্রসূন, ১৯৮০: ১৩৫)

অর্থাৎ, নারীকে দেখে নিরাশ হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে আবার তার শয্যায় ফিরে এল। তার মুখ বিবর্ণ– এ যেন শীতের আগমনে নিষ্প্রভ চন্দ্রের আলোকে আকাশের ছবি।

কবি এখানে শীতের আগমন বলতে সম্ভবত হেমন্তকালীন অবস্থার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। হেমন্তকালের সকালের শিশির ভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশায় প্রকৃতিতে বেজে উঠে শীতের আগমনী বার্তা। ঋগবেদে (I. 164. 2) সূর্যের তিন 'চক্র'-এর কথা উল্লেখিত আছে। যা মূলত গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত এ তিনটি ঋতুকেই উপস্থাপন করে। অন্য ঋতুগুলো মূলত এই তিনটি ঋতুরই অঙ্গীভূত (Bhagvat datta, 1959: 216)।

৫. উপসংহার

ওপরের আলোচনায় দেখা যায়, মহাকবি অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরানন্দ মহাকাব্য দুটি বুদ্ধের জীবন-দর্শন সংশ্লিষ্ট হলেও কবি মূল আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন ভারতের নৈসর্গিক বিভিন্ন উপাদানের চিত্র সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। কবি প্রাকৃতিক নানান উপাদনসমূহ তাঁর কাব্যে কোথাও সরাসরি আবার কোথাও উপমা এবং দৃষ্টান্ত প্রয়োগের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। তিনি মূলত মানুষের শারীরিক ও মনোজাগতিক বৃত্তিসমূহ

প্রকৃতির বিভিন্ন অনুসঙ্গের সাথে তুলনা করে প্রাচীন ভারতের নৈসর্গের অপরূপ ছবি এঁকেছেন তাঁর অমর মহাকাব্যদ্বয়ে। ঋগ্বেদ, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্যে যেভাবে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, প্রাণী, ফুল-ফল, ঋতুচক্র, বন-বনানী, গাছপালা, লতা-গুল্ম, ঝোঁপ-ঝাড় প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায় মহাকবি অশ্বঘোষের মহাকাব্যদ্বয়েও প্রকৃতির সেই নৈসর্গিক উপাদানগুলোর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ধারণা করা যায় কবি অশ্বঘোষ সেসব সাহিত্য দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে কবি পরিশীলিত এবং মাধুর্যময় উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করে শুধুমাত্র যে মুন্সিয়ানার পরিচয় প্রদান করেছেন তা নয়, এর মাধ্যমে অশ্বঘোষের স্বদেশ প্রেমের স্বাক্ষরও পাওয়া যায়। কবি যেসব পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীর উল্লেখ করেছেন তার সবই বর্তমানে বিদ্যমান আছে। তবে কবি যেভাবে সেসবের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন তা বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে ম্রিয়মান। তাই উৎসাহী এবং অনুসন্ধিৎসু ইতিহাসবিদ, পরিবেশবাদী এবং পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কাছে প্রাচীন ভারতের নৈসর্গিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য অশ্বঘোষের মহাকাব্য দুটি অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে মহাকাব্যদ্বয়ে উপস্থাপিত বিভিন্ন প্রাণী, ফুল-ফল, ঋতুচক্র, বন-বনানী, গাছপালা, লতা-গুল্ম, ঝোঁপ-ঝাড় সম্পর্কিত তথ্যসমূহ আমাদের নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে নানা আঙ্গিকে।

উল্লেখপঞ্জি

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক [প্রধান সম্পা.] (২০১৫)। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

প্রসূন বসু [সম্পা.] (১৯৮৯)। *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*। ১ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা।

প্রসূন বসু [সম্পা.] (১৯৮০)। *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*। ৯ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা।

বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী (১৯৯৫)। *বৌদ্ধ সাহিত্য*। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা,

মোঃ সাইদুজ্জামান (৬ নভেম্বর ২০১৫) বাংলা সাহিত্যে ঋতুবৈচিত্র্য। *দৈনিক জনকণ্ঠ*। (https://www.dailyjanakantha.com/literature/news/152527)।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (২০০৩)। *বুদ্ধদেব*। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।

Alexander Cunningham (1963). *The Ancient Geography of India*. Indological Book House, Varanasi.

Bimala Churn Law (1941). *India in Early Texts of Buddhism and Jainism*. Luzac & Co., London.(1954). *Historical Geography of Ancient India*. Societe Asiatique De Paris, France.

Bhagvat datta (1959). *Ved-Vidhyā-Nidarshana*. Itihas Prakashan Mandala, New Deldi.

Debiprasad Chattopadya (1980). *Taranatha's History of Buddhism in India*. K. P. Banch & Company, Calcutta.

E. Hultzsch (1969). *Corpus Inscriptionum Indicarum*. Vol. 1, Indological Book House, New Delhi.

James Legge (1836). *The Record of Buddhist Kingdoms, The Chinese monk Fa-hein*. Oxford.

M. Leon Feer (1888). *Samyutta Nikaya*. Vol. 2. Pali text society, London. (http://www.discoveringbuddha.org/wp-content/uploads/2016/08/PTS-Samyutta-Nikaya-Vol-2-Feer-1888.pdf)

M. Leon Feer (1898). *Samyutta Nikaya*. Vol. 5. Pali text society, London. (http://www.discoveringbuddha.org/wp-content/uploads/2016/08/PTS-Samyutta-Nikaya-Vol-5-Feer-1898.pdf)

N. L. Dey (1971). *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India*. Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi.

N. A. Jayawickrama (1971). *The Chronicle of Thupa and The Thupavamsa*. Luzac & Company Ltd. London.

Prof. E. Hardy (1899). *The Anguttara Nikaya*. Pali text society, London.

Pargiter, Frederick Eden (*1904). Markandeya Purana. The Baptist Mission Press, Calcutta.*

Suresh Chandra Banerji (1962). *Dharma-Sūtras (A Study in their Orogin and Development)*. Punth Pustak, Calcutta.

S. M. Ali (1966). *The Geagraphy of the Puranas*. People's Publishing House, New Delhi.

Sarala Khosla (1986). *Asvaghosa and His Times*. Intellectual Publishing House, New Delhi.

V. Trenckner (1962). *The Milindapañnho*. Pali Text Society, London.

Wilhelm Geiger (1912). *The Mahāvamsa or the Great Chronicle of Ceylon*. Pali text society, London.